জাতীয় বাজেট ২০২০-২১: উপকূলীয় বাঁধ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা

১. 'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা'

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও চলমান কোভিড-১৯ মহামারি প্রেক্ষাপটে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এ অবস্থায় গত ১১ জুন ২০২০ জাতীয় সংসদে আসন্ন ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ ফ ম মুস্তফা কামাল,এমপি। 'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা' শিরোনামে প্রস্তাবিত এই বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। যা আমাদের জিডিপির ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ। এবারের বাজেটে চলামান কোভিড-১৯ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি, বাজেটের। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি নিয়ে আগামী অর্থবছর শুরু হবে। সুতরাং এই বিপুল পরিমার ঘাটতী বাজেট যদি সরকারের প্রচলিত আর্থিক খাত থেকে সমন্বয় (ঋণ নিয়ে) করতে তাহলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস পাবে এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। একই সাথে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রবনতা বিগত কয়েক বছরের তুলানায় করোনা সংকটের কারনে আরও তীব্র হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন। সেক্ষেত্রে ৮.২% প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে কিনা তাও সন্দেহ, পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা হ্রাস হবে কিনা তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

২. ঘাটতি বাজেট কী আমরা সব সময় পূরণ করতে পেরেছি?

সাধারণত সরকার দুটি উৎস থেকে ঘাতটি বাজেট মোকাবেলা করে। সেগুলো হলো অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন ব্যাংক থেকে লোন নেয়া অথবা বৈদেশিক সহায়তা ও ঋণের মাধ্যমে। সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এর ফলে প্রনোদনার জন্য ব্যাংক থেকেই লোন নিতে হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে, আগামী অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় দেশের অভ্যন্তরের ব্যাংক থেকে টাকা পাওয়া কঠিন হবে। কারণ ব্যাংক সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থের জোগান দিচ্ছে। অন্যদিকে, চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রভাব সারা পৃথিবীতে অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার কারণে বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তিও অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে বিধায় এ খাত থেকে ঘাতটি বাজেট মোকাবেলা পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ সম্ভব হবে না। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুতই স্বাভাবিক হবে না, এটাও বোঝা যাচ্ছে। তাই আগামী অর্থবছরে প্রত্যাশিত রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও বেশ চ্যালেঞ্জিং। দিনশেষে, সরকার হত-দরিদ্রেদের খাত থেকে বাজেট কমিয়ে দিয়ে, ঘাতটি বাজেট মোকাবেলা করবে তা অনেকটাই ধারণা করা যায়। গত কয়েকবছরের বাজেত পর্যালোচনা করে এমন সিদ্ধান্তেই আসা যায়। যেমন ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ছিলো ২,১১,৬৮৩ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ করা কয় ২,০২,৩৪৯ কোটি টাকা। তার মানে

দাড়ালো সরকার ঘাটতি বাজেট মোকাবেলার জন্য উন্নয়ন ব্যয় কমিয়েছে ৯,৩৩৪ কোটি টাকা। সুতরাং স্পটতই দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ (রাজস্ব আদায়) ও বৈদেশিক সম্পদ সমাহারনের দুর্বলতা/ব্যর্থতা বেশিরভাগ ঘাটতি বাজেট থেকে সমন্বয় করতে হয়। ফলে তা দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন খাতের বাজেটই কাট-ছাট করা হয়েছে।

৩. প্রস্তাবত জাতীয় বাজেটে বাধঁ নির্মানে বরাদ্দ উপেক্ষীত হওয়ায় উপকূলীয় এলাকায় দারিদ্র অন্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি হতে পারে

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোন উদ্যোগ/ বরাদ্দ কিংবা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কোন প্রনোদণা এই বাজেটে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ফলে ১১০০ কোটি টাকার ক্ষতি কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তা অস্পস্ট রয়েছে। পাশাপাশি উপকূলীয় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। ৪১৫ কিলোমিটার সড়ক বিলীন হয়েছে। কৃষিতে ১,৭৬,০০০ হেক্টর জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। লক্ষাধিক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি ও মাছের ক্ষেত্র নষ্ট হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম অত্যন্ত স্লথ/বন্ধ হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এর প্রভাব অনেক বেশি। আমরা জানি দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যবলী যা আমাদের মোট জিডিপির ১৭%। পাশাপাশি, চলমান কোভিডঃ-১৯ এর কারণে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। করোনা চলাকানীন বাংলাদেশের উপকূলে জনগোষ্ঠির উপর পরিচালিত গবেষণা দেখা গেছে, কোভিডের ফলে দরিদ্র জনগণ মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদের ঋণ নিয়েছে উপকূলের ৬৩ শতাংশ মানুষ। ৫৭ শতাংশ পরিবারের আয় এক-চতুর্থাংশে নেমে এসেছে। আয় অর্ধেকে নেমে এসেছে প্রায় ১৯ শতাংশ পরিবারের। তাই আশংকা করা হচ্ছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ না দিলে উপকূলীয় দারিদ্রের হার অন্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি হতে পারে।

৩.১ সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও উপকূলের ক্ষয়ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় বেড়িবাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। এর মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালীতে বেড়িবাঁধ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধুমাত্র সাতক্ষীরায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৭ কিলোমিটার এবং খুলনায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৩৯ কিলোমিটার। ভোলায় প্রায় ১৮ কিলোমিটার, এবং কক্সাবাজারে প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ যে, ভোলা জেলার ১৮টি দূরবর্তী

চরসমূহে কোন বেড়িবাঁধ নেই যেখানে প্রায় ৫০-৬০ হাজার মানুষ বাস করছে। অন্যদিকে, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা দ্বীপটিতে কোন সুরক্ষিত বেড়িবাঁধ না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় এখানকার প্রায় ১,২৫,০০০ জনগোষ্ঠী সব সময়ই দুর্যোগ ঝুঁকির মাঝেই থাকে। বাগেরহাটে প্রায় ১০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে শরণখোলা উপজেলার ৩৫/১ পোল্ডারের ঝুকিপূর্ণ বগী-গাবতলার এলাকার ২ কিলোমিটার বাঁধ প্রায় প্রতিটি দুর্যোগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- বেড়িবাঁধ ভাঙ্গার ফলে তাৎক্ষনিকভাবে এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ পানি বন্ধী হয়ে যায়। যদিও পানি সরে যায়, কিন্তু প্রতিদিন জোয়ার-ভাটার কারণে এ সকল এলাকা প্লাবিত হচ্ছে এবং জণগনের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বাধসমূহ ভাঙন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উঠতি ফসল নষ্ট বা ধবংস হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকায় এখন কঠিন পরিস্থিতি পার করছে। পাশাপাশি, চলমান করোনাভাইরাস এ সঙ্কট আরো তীব্র করেছে। মানুষ কাজের সন্ধানে বের হওয়ার চেষ্টা করলেও তা আসলে সম্ভব হচ্ছে না।
- ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধসমূহ সংস্কার বা মেরামত না হওয়ার ফলে ফসলি জমিগুলো লবণাক্ত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এখানে ফসল হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উল্লেখ, ২০০৯ সালে আইলায় কারণে সমুদ্রে লোনা পানি প্রবেশের ফলে যে পরিমাণ ফসলী জমি ক্ষতি হয়েছিল তা এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কারণ আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাধসমূহ পুনর্নির্মাণ, সংস্কার সম্ভব হয়নি।

সরকারি হিসাবে, প্রাথমিক প্রাক্কলনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধসমূহের আর্থিক ক্ষতি ৪০০ কোটি টাকা। তবে প্রকৃত প্রাক্কলণ আরো বেশিও হতে পারে।

৩.২ দুর্যোগের কারণে উপকূলের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কৃষি ও কৃষি-উপখাত সবসময়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তান্ডবে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।দেশের ২৬ জেলায় প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার হেক্টর জমির কৃষি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে মৌসুমী ফল, পাট, বোরো ধান, মুগডাল এবং গ্রীষ্মকালীন সবজি। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ৪৭ হাজার হেক্টর বোরো ধানের, ৩ হাজার ২৮৪ হেক্টর ভুট্টা, ৩৪ হাজার ১৩৯ হেক্টর পাট, ২ হাজার ৩৩৩ হেক্টর পান, ৪১ হাজার ৯৬৭ হেক্টর সবজি, ১ হাজার ৫৭৫ হেক্টর চীনাবাদাম , ১১ হাজার ৫০২ হেক্টর তিল, ৭ হাজার ৩৮৪ হেক্টর আম, ৪৭৩ হেক্টর লিচু, ৬ হাজার ৬০৪ হেক্টর কলা, ১ হাজার ২৯৭ হেক্টর পেঁপে, ৩ হাজার ৩০৬ হেক্টর মরিচ, ৭ হাজার ৯৭৩ হেক্টর মুগডাল এবং ৬ হাজার ৫২৮ হেক্টর আউশ ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ । শুধুমাত্র সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ৬০-৭০ ভাগ আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাওনের তথ্য মতে, জেলার কৃষিতে ১৩৭ কোটি ৬১ লাখ ৩০ হাজার টাকার কৃষি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ফলে প্রায় ৮ লাখ কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সরকারি হিসাবে শুধুমাতে ফলের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। যদিও বলার অপেক্ষা রাখে না প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি। এর আগে কৃষক তরমুজ ও কাঠালে করোনার ক্ষতি গুণেছে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় এল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে। সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত ১২ জেলায় শুধুমাত্র আম নষ্ট হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার।

ঘূর্ণিঝড়ে মৎস্যখাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিংড়ির ঘের। ২০ হাজারেরও অধিক চিংড়ির ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রাণিসম্পদের ক্ষতি হয়েছে ১৪০ কোটি টাকার মত। বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য কার্যালয় এর তথ্য মতে, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্রাথমিক হিসাবে বরিশাল বিভাগের ৬ জেলায় ১৯ হাজার ২৪টি মাছের খামার, ঘের ও পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। এতে এসব পুকুর ও ঘেরের মাছসহ অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। তবে সরকারি হিসাবের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতি আরও চার-পাঁচ গুণ বেশি বলে জানিয়েছেন মাঠ পর্যায়ের মৎস্যখামারিরা। বাগেরহাট মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে জেলায় ৭৮, ১০০টি মাছের ঘের রয়েছে, এর মধ্যে আম্পানের ফলে বেড়িবাঁধ ও রাস্তা উপচে এবং কোথাও কোথাও বাঁধ ভেঙে জোয়ারের পানি প্রবেশ করায় মোট ৪ হাজার ৬৩৫টি মাছের ঘের ভেসে গেছে। সরকার মৎস্য খাতে ৪০০ কোটি টাকার হিসাব করেছে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। কারণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সরাসরি মাঠ থেকে বিশেষ করে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আসা উচিত। তাহলে প্রদত্ত ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র পাওয়া যাবে। উক্ত ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব থেকে কয়েকগুণ বেশি হবে বলে আমরা মনে করি।

৩. ৬০-এর দশকের উপকূলীয় বেড়িবাঁধ, বর্তমান প্রতিকূল অবস্থা সামাল দিতে পারছে না

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে বাংলাদেশের মোট বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য ১৬,২৬১ কিলোমিটার যার মধ্যে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য ৫৭৫৭ কিলোমিটার। এসকল বাধঁ সময়মত ও পরিকল্পনা মাফিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারন ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাস এসকল বাঁধ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে জনগণের জীবন-সম্পদের ঝুকিঁও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি চাষের কারণেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাঁধ। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৬০'এর দশকে বেড়িবাঁধসমূহ তৈরী হয়েছিল মূলত সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা কৃষি জমিসসমূহ রক্ষা করা এবং কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। যে কারণে বাঁধের উচ্চতা সাগরের সাধারণ জোয়ার ধারাকে মাথায় রেখেই ঠিক করা হয় এবং সে অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, জোয়ার ভাটার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ সকল বাঁধসমূহ কোনভাবেই প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে পারছে না।

ফলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যামান বেড়িবাধসমূহ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলকে নিরাপদ রাখতে পারছে না। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় আম্পান তার বড় প্রমাণ। কোস্ট ট্রাস্ট ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ঠিক পর পরেই এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট পানি ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ডঃ আইনুন নিশাত বলেন, সার্বিক বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনজিত অভিঘাত মোকাবেলায় বিদ্যামান ও আগামীতে নির্মাণ করা হবে এইসকল বাঁধগুলোর উচ্চতা ২০-২৫ ফুট করতে হবে। সুতরাং বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় এই বিষয়টকে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৪. পরিকল্পনায় উপকূলীয় টেকসই বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে

পরিকল্পনায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ভাঙন কবলিত এলাকাসমূহ যেমন ভোলা, পটুয়াখালী, কক্সবাজারসহ অনান্য উপকূলীয় জেলা সমূহের টেকসই বা দীর্ঘমেয়াদি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণে স্পষ্ট পরিকলনা বিগত বাজেটগুলোতে ছিল না। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এ যাবত পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাই সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রতিবছর বাঁধ নির্মান ও মেরামতের জন্য আলাদা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারলে। সরকারের নীতি-নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই পরিকল্পনা বাস্তনায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

৫. প্রস্তাবিত বাজেটে বাজেটে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে !!

উপকূলীয় এলাকায় বাধঁ নির্মাণ, মেরামত ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮,০৭৯ কোটি টাকা। যেখানে প্রশাসনিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮২০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,২৬৯ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের মাত্র ১.২৫ শতাংশ এবং জিডিপির মাত্র ০.২৫ শতাংশ। প্রয়োজনের তুলনায় বাজেট অত্যন্ত অপ্রতুল। এখানে উল্লেখ্য যে পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের সকল এলাকায় (উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকা) বাঁধ নির্মানের জন্য দায়ীত্ব প্রাপ্ত এবং সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে শুধূমাত্র উপকূল এলাকায় প্রয়োজনীয় টেকসই বাঁধ (প্রায় ৬০০০ কিঃমিঃ) প্রয়োজন। এর জন্য যদি দশ বছর মেয়াদী পরকিল্পনা নেওয়া হয় তাহলেও সরকারকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০,০০০-১২,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিত। বিপন্ন এ সকল এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে বাঁধের উপর। বাঁধের ক্ষতি হলে তাদের সব ভেসে যায়। ফসল নষ্ট হয়, বাড়িঘর নষ্ট হয়। সুতরাং জরুরী ত্রাণ কিংবা খাবার না দিয়ে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করে দেওয়াটাই তাদের প্রধান দাবি। বাঁধের ফাঁদ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. জলবায়ু সহনশীল উপকূলীয় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণে আমাদের দাবীসমুহ বিবেচনা করতে হবে

৬.১ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও অর্থায়ন

ক. জরুরি ভিত্তিতে আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলো মেরামত ও সংস্কারের জন্য সরকারকে ৪০০ কোটি টাকা আলাদাভাবে বাজেটে বরাদ্দের ঘোষণা দিতে হবে।

খ. এই বরাদ্দ সরাসরি স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে তাদের চাহিদা অনুযায়ি বন্টনের ঘোষণাও দিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনে তা মেরামত করবে।

৬.২ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও অর্থায়ন

ক. প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে বাঁধ মেরামত ও বাঁধ নির্মাণ এই দুই খাতে সরকারকে আলাদা / পৃথক বরাদ্দের ঘোষণা করতে হবে।

খ. আমরা যদি ১০ বছর মেয়াদি টেকসই বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা করি তাহলে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে বাঁধ নির্মাণ খাতেই ১০,০০০- ১২,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. পরিকপল্পনায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। ভাঙণ কবলিত জেলাগুলো যেমন ভোলা, পটুয়াখালী, কক্সাবাজার এর বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং বাঁধ নির্মাণে টেকসই বা দীর্ঘ মেয়াদি সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ঘোষণা আমরা জাতীয় বাজেটে প্রত্যাশা করি।

ঘ. দীর্ঘমেয়াদেও সকল বাঁধের জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এই তিনটি খাত স্থানীয় জনগণের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। এর সকল বিষয় কোন ভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাতে রাখার প্রয়োজন নাই বলে আমরা মনে করি, তারা শুধু তদারকির দায়ীত্বটি পালন করতে পারে।

ঙ. পানি উন্নয়ন বোর্ড জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে উপকূলের পানি ব্যবস্থাপনার প্রভাব পর্যবেক্ষন, বিশ্লেষন করবে। সে আলোকে দীর্ঘমেয়াদে বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা, ডিজাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করবে। তবে সেখানৌ স্থানীয়দের কারিগরী সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে থাকবে।

সচিবালয়ঃ কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২/ ৯১২০৩৫৮, ই মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net